ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1896-1903
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.413

রবীন্দ্র কাব্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’: একটি বিশ্লেষণ

ড. শতাব্দী ভৌমিক, *স্বাধীন গবেষক, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.03.2026; Accepted: 29.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

While engaged in the work of the Zamindari in Orissa, Rabindranath composed the poetic drama 'Chitrangada' while sitting in the hut of Pandua. However, it was published in the 'Sadhana' magazine in the month of Bhadra, a year after its composition. Rabindranath Tagore translated this poetic drama 'Chitrangada' into English again, naming it 'Chitra' (1913). Rabindranath Tagore used the story of Arjuna and Chitrangada in the Mahabharata in a different way. The connection between the original Mahabharata story and the poetic drama written by Rabindranath is very tenuous. The character of Chitrangada is a completely independent creation of Rabindranath. He has molded this character. Rabindranath wanted to express a special theory through the character of Chitrangada, which Rabindranath himself hints at at the beginning of the poetic drama: If a beautiful young woman feels that she has deceived her lover's heart with the illusion of her youth, he may reproach her for making her beauty the main part of his fortune. When Rabindranath tried to give this idea the form of a poetic drama, he was reminded of the story of Arjuna and Chitrangada from the Mahabharata. Incidentally, in this case, when Rabindranath Tagore is making some structural changes from a poetic drama to a drama 'Chitra', there are some differences due to translational changes.

Keywords: Sadhana, molded, deceived, illusion, reproach, translational

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১–১৯৪১) যখন ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১৮৯১) রচনা করছেন তখন তিনি উড়িষ্যার জমিদারি দেখাশোনার জন্য পান্ডুয়ার কুঠিতে ছিলেন। উড়িষ্যার জমিদারীর কাজে নিযুক্ত থাকার সময় পান্ডুয়ার কুঠিতে বসে রবীন্দ্রনাথ ‘চিত্রাঙ্গদা’ কাব্যনাট্য রচনা করেন। কিন্তু প্রকাশিত হয় রচনার এক বছর পরে ১২৯৯ সালে ভাদ্র মাসে ‘সাধনা’ পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে এই কাব্যনাট্যের জন্য ছবি এঁকেছিলেন তরুণ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। আর সেকারণেই রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। সেখানে লেখেন- “তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহ-আশীর্বাদ দিলাম।”[১] মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা এবং অর্জুনের যে কাহিনি রয়েছে তাকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ এই অসামান্য কাব্যনাট্য রচনা করলেন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখছেন –

> "নরনারীর যৌন-অনুরাগে পরস্পরকে পাইবার শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা এই কাব্যে ভাষা পাইয়াছে। মানব-বুভুক্ষার আদিম প্রেরণাকে কবি স্থূল হস্তে স্পর্শ করেন নাই – যদিও তাহার অবসর ছিল যথেষ্ট; উহাকে লইয়া সৌন্দর্যলোকের একটা নূতন স্বর্গ, নারীচিত্তের একটি অপরূপ মহিমা সৃষ্টি করিলেন। ভাষার মধ্য দিয়া শব্দের 'কুহকজাল' প্রধানত নিন্দার্থক দীপ্তিতে কী অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে, তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইতেছে 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য"[২]

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার কাহিনিকে প্রয়োগ করলেন অন্যভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে। মহাভারতে আমরা দেখি অর্জুন অগস্ত্যবট, বশিষ্ঠ পর্বত এবং তুঙ্গনাথে উপস্থিত হয়ে আত্মশুদ্ধি করার পর ব্রাহ্মণদের অনেক ধন দান করলেন। তারপর তিনি বিভিন্ন তীর্থ দর্শনের উদ্দশ্যে গমন করলেন। তাঁর অনুগামী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গ রাজ্য থেকে ফিরে গেলে, অর্জুন অল্পসংখ্যক সহচর নিয়ে সমুদ্র সন্নিহিত দেশগুলিতে যাত্রা শুরু করলেন। এরপর তিনি মহেন্দ্র পর্বত দর্শনের পর সমুদ্র বরাবর পথ অনুসরণ করে মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হন। মণিপুর রাজ্যের বিভিন্ন তীর্থ ও পবিত্র স্থান পরিভ্রমণের পর মণিপুরের ধার্মিক রাজা চিত্রবাহনের কাছে এসে উপস্থিত হন। রাজার চিত্রাঙ্গদা নামের এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার রূপে মুগ্ধ হন এবং রাজাকে বলেন –

> "দৃষ্ট্বা চ তাং ববারোহাং চকমে চৈত্রবাহনীম্।।১৬।।
> অভিগম্য চ রাজানমবদৎ স্বং প্রয়োজনম্।
> দেহি মে খল্বিমাং রাজন্! ক্ষত্রিয়ায় মহাত্মনে।।১৭।।
> তচ্ছ্রু ত্বা ত্বব্রবীদ্রাজা কস্য পুত্রোহসি নাম কিম্।
> উবাচ তং পান্ডবোহহং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।।১৮।।"[৩]

অর্জুন রাজার কাছে তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দেন। রাজা তখন অর্জুনের পরিচয় জানতে চান। অর্জুনের পরিচয় জানার পর রাজা অর্জুনকে জানান তাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিল। অপুত্রক হওয়ার জন্য রাজা পুত্র কামনায় মহাদেবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন। মহাদেব তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে বর দেন –

> "স তস্মৈ ভগবান্ প্রাদাদেকৈকং প্রসবং কুলে।। ২১।।
> একৈকঃ প্রসবস্তস্মাদ্ভবত্যস্মিন্ কুলে সদা।
> তেষাং কুমারাঃ সর্ব্বেষাং মম জজ্ঞিবে।।২২।।"[৪]

অর্থাৎ রাজার বংশে প্রত্যেক পুরুষের একটি করে পুরুষ সন্তান হবে। রাজার পূর্বপুরুষ সকলের পুরুষ সন্তান ছিল। কেবলমাত্র রাজারই একটা কন্যা সন্তান হয়। রাজা অর্জুনকে জানান, তিনি তাঁর কন্যাকেই পুত্র হিসেবে পালন করে এসেছেন। এই কন্যার যে পুত্রসন্তান হবে সেই রাজার বংশকর হবে এই বিধান অনুসারে রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন। তাই অর্জুনের যে সন্তান হবে তাকে যদি অর্জুন চিত্রবাহন রাজার বংশকর হিসেবে দিতে বদ্ধ পরিকর হন তাহলে রাজা তাঁর কন্যার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহে সম্মতি দেবেন এই কথা জানান। অর্জুন রাজাকে কথা দেন এবং তিন বছর রাজবাড়িতে বাস করেন। এটা ছিল মহাভারতে অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার কাহিনি। যে কাহিনিতে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির কেবলমাত্র উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যনাট্যের সঙ্গে মূল মহাভারতের কাহিনির সংযোগ খুবই ক্ষীণ। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এই চরিত্রটিকে ঢেলে সাজয়েছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির মাধ্যমে। যার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিচ্ছেন কাব্যনাট্যের সূচনায় –

> "সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মূখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এড় পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়।"[৫]

এই ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যনাট্যের অবয়বে রূপ দিতে চেয়েছেন তখনই তাঁর স্মরণে এসেছে মহাভারতের অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার কাহিনি। হয়তো রাজা প্রভঞ্জনের কন্যাকে পুত্র হিসেবে পালন করার এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে কোথাও নাড়া দিয়েছিল। আর তাই চিত্রাঙ্গদার, পুরুষের মনকে নারীর সহজাত প্রতিভায় জয় করে নেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকা। যা থেকেই কাহিনির সূত্রপাত। এই ভাবটিকে কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে পরিবেশনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এগারোটি দৃশ্যে এটিকে বিভক্ত করলেন। রবীন্দ্র কাব্যনাট্যে দেখি, চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে প্রত্যক্ষ করে এবং তার বর্ণনা সে মদন ও বসন্তের কাছে করে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার যে জন্মবিবরণ রয়েছে তা চিত্রাঙ্গদার সংলাপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন তাঁর এই রচনায় –

"চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা মণিপুররাজকন্যা।
মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না –
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি।"[৬]

পুরুষের বেশে যুবরাজরূপে সে স্বেচ্ছায় তার জীবন যাপন করেছে। তাই নারীর সহজাত সুনিপুণ ভঙ্গিমা তার অজানা। শিকারের সময় অর্জুনকে কীভাবে চিত্রাঙ্গদা দর্শন করেছে এবং তার ফলস্বরূপ তার মধ্যে নারীচিত্তের জাগরণ ঘটেছে তার ভাব ব্যক্ত করেছেন নাট্যকার –

"চিত্রাঙ্গদা। একদিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণা–নদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য–অন্ধকার
লতাগুল্মে গহন গম্ভীর মহারণ্যে
... ...

সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।"[৭]

নারীত্বের বিকাশ তথা জাগরণের বিবরণ চিত্রাঙ্গদা স্বয়ং দিয়েছেন মদনের কাছে। এরপরই চিত্রাঙ্গদার মুখে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর প্রেম নিবেদনের ব্যর্থতার কাহিনি। অনভ্যস্ত সাজে নিজেকে সজ্জিত করে চিত্রাঙ্গদা অরণ্যের শিবালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রেম নিবেদন করলে, তাঁর কাছে ফিরে আসে অর্জুনের প্রত্যাখ্যান বাণী –

"চিত্রাঙ্গদা। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল –
"ব্রহ্মচারিব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।"[৮]

অর্জুনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে চিত্রাঙ্গদা নিজেকে ধিক্কার জানিয়েছে। নারী হয়ে পুরুষের মনকে জিততে না পারায় নিজের সকল অধীত বিদ্যা তাঁর কাছে ব্যর্থ মনে হয়েছে। তাই মদন এবং বসন্তের কাছে সৌন্দর্যের ভিক্ষা জানিয়েছে যাতে সে জিতে নিতে পারে অর্জুনের মন। তাই চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে ধ্বনিত কাতর আবেদন –

"চিত্রাঙ্গদা। হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
এক দন্ডে লয়েছ ছিনিয়া – সব বিদ্যা
সব বল করেছ তোমার পদানত।
এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।"[৯]

চিত্রাঙ্গদার মনে হয়েছে হাতে সময় থাকলে সে নিশ্চয়ই অর্জুনের হৃদয় তিলে তিলে জয় করতে সক্ষম হত। সঙ্গীরূপে রণক্ষেত্রে সারথি হয়ে, মৃগয়ায় অনুচর সেজে, শিবিরে রাতের প্রহরী হিসেবে ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত পালন করত সে। তারপর হৃদয় উন্মোচন করত, অর্জন করে নিত সে অর্জুনের মনে তাঁর চিরস্থান। কিন্তু সেই সুযোগ না থাকায় চিত্রাঙ্গদা ঋতুরাজের কাছে একদিনের জন্য অপূর্ব সুন্দরী হতে চেয়েছে। মদন এবং বসন্ত কেবল একদিনের জন্যে নয় এক বছরের জন্যে চিত্রাঙ্গদার বাসনাকে স্থায়িত্ব দান করে, তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছে। আর এখানেই প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটেছে। দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয়েছে অর্জুনের মনে চিত্রাঙ্গদার রূপদর্শনের মোহমুগ্ধতা দিয়ে –

"অর্জুন। ... ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশ্বর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমকিয়া মিলাইয়া গেল।"[১০]

এরপর অর্জুন নিজে চিত্রাঙ্গদার আশ্রমে উপস্থিত হয়। ভঙ্গ হয় দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য ব্রত। অর্জুনের মনে হয় খ্যাতি, বীর্য, সব মিথ্যা, চিত্রাঙ্গদার কাছেই সে তাঁর পূর্ণতাকে খুঁজে পায়। কিন্তু এইখানেই নাট্যকার তাঁর মূল যে তত্ত্ব সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অর্জুনের মুখে নিজের স্তুতি শুনে হাহাকার ওঠে চিত্রাঙ্গদার মনে

"চিত্রাঙ্গদা। ... কোথা গেল

প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী।"[১১]

চিত্রাঙ্গদার বাহ্যিক সৌন্দর্যে অর্জুন আকৃষ্ট হওয়ায়, চিত্রাঙ্গদা মনে মনে আহত হয়েছে। আর তাই তৃতীয় দৃশ্যে মদনকে তার বর ফিরিয়ে নিতে বলেছে। দেহের সোহাগে অন্তর জর্জরিত হয়েছে চিত্রাঙ্গদার। আর তাই নিজের স্বরূপে ফিরে আসতে চেয়েছে সে। কিন্তু বসন্তের আশ্বাস বাক্যে চিত্রাঙ্গদার অন্তরের দোলাচলতা দূরীভূত হয়েছে। এরপর চতুর্থ থেকে অষ্টম দৃশ্য পর্যন্ত ক্রমে চিত্রঙ্গদার প্রেমকে তীব্র আসক্তি এবং ক্রমে সেই আসক্তি থেকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়কেই নাট্য সংলাপের কাব্যিক ছন্দ মাধুর্যে পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর তাই নবম দৃশ্যে, রাজ্যে চিত্রাঙ্গদার অনুপস্থিতিতে, বনচরদের মনে নিরাপত্তাহীনতা দেখে, অর্জুনের মনে রমণী রক্ষকের প্রতি কৌতূহল জন্মেছে। যা সে প্রকাশ করেছে নবযৌবন প্রাপ্ত মদন বসন্তের আশির্বাদ ধন্য চিত্রাঙ্গদার কাছে। সেই কৌতূহলকে নিরসন করেছে চিত্রাঙ্গদা নিজেরই অতীত অভিজ্ঞতাকে, নিজেরই যন্ত্রনাকে, রাজকন্যার রূপকে পরিবেশন করে। আর এখানেই ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যান পাঠক। একদিকে অর্জুন 'পুষ্পগন্ধমদিরার নিদ্রাঘনঘোর অরণ্যের অন্ধগর্ভ' থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে, অন্যদিকে চিত্রাঙ্গদার মনেও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে নিজের আসল স্বরূপে ফিরে আসবে! নাকি 'দুদিনের অমূল্যধন' এই যৌবনকে আঁকড়ে ধরবে। ক্রমশ নিজের প্রেয়সীকে রহস্যময়ী বলে প্রতিভত হয় অর্জুনের কাছে। কিন্তু অর্জুন তাঁর প্রিয়তমের মনে কোনো আঘাত দিতে নারাজ। এই রহস্য, দোলাচলতা এবং দ্বন্দ্ব দিয়ে নবম দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটেছে। দশম দৃশ্যে, মদন, বসন্ত এবং চিত্রাঙ্গদার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারি, রাত্রি শেষে চিত্রাঙ্গদার স্বরূপে প্রত্যাবর্তন। শেষ দৃশ্যে, অনিবার্যভাবেই এসেছে অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার কথোপকথন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রাঙ্গদার রাজকন্যারূপে নিজের অভিব্যক্তিকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশের কারণ এবং নিজের আত্মনিবেদনের যথার্থতা অসংকোচে নিজের ভালোবাসার কাছে প্রকাশ করেছে। জানিয়েছে, সুখে দুখে সহচরী করলেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানা সম্ভব। চিত্রাঙ্গদা সন্তানসম্ভবা। অর্জুনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সন্তানকে দ্বিতীয় অর্জুন তৈরী করবে সে এবং পাঠিয়ে দেবে অর্জুনের কাছে। এখানেই চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির সার্থকতা। যেখানে স্বয়ং অর্জুন যেন কোথাও গিয়ে ম্লান হয়ে যান। তাঁর যেন সত্যিই আর কিছু বলার থাকে না কেবল এটুকু ছাড়া –

"প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।"[১২]

সুতরাং কাহিনি এবং দৃশ্য সংস্থাপন আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমি দেখালাম মহাভারতের কাহিনিকে কীভাবে উপকরণ হিসেবে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে নতুনত্ব আনলেন যা এক অমর সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে। মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির কেবলমাত্র উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদাকেই নিজে হাতে গড়ে তুললেন। অর্জুনকে রাখলেন গৌণ ভূমিকায়। খুব অসহায়ভাবে ঘটনা ঘটতে দেওয়া ছাড়া, যার কোনো ভূমিকাই নেই। অন্যদিকে মদন এবং বসন্ত চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের সংযোজন। এদের দিয়ে কাহিনি নিজের হাতে পরিচালনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চরিত্র দুটি কাব্যনাট্যে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। চরিত্র দুটির নির্মাণ সার্থক হয়েছে। যৌবনে উচ্ছ্বাস এবং একঘেয়েমিকে তুলে ধরতে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাটকীয় ঘটনা পরম্পরা পাঠকের কাছে অনেক বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এই কাব্যনাট্য রীতিতে, সংলাপ চরিত্রের আবেগকে পাঠকের হৃদয়ের আরও কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। আর তাই কাহিনি বয়ন, চরিত্র নির্মাণ, ঘটনার

পরিবেশন, সংলাপ সব কিছুই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব কল্পনায় জারিত করে পাঠককুলের রসভোগ্য করে নির্মাণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'-র আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, যার নাম দিচ্ছেন 'চিত্রা' ('Chitra' 1913). আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, সময়টা ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ের কাল। 'গীতাঞ্জলি' –র বিশ্বস্বীকৃতির পর, রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব প্রতিভার দ্বার পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে তুলে ধরতেই তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মের অনুবাদ কার্যে লিপ্ত হচ্ছেন। নাটকের ক্ষেত্রে তার সূচনা করছেন 'চিত্রাঙ্গদা' দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যনাট্য থেকে নাট্য 'Chitra'-র খানিকটা কাঠামোগত পরিবর্তন করছেন। তাতে ভাষান্তরগত পরিবর্তনজনিত কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। 'Chitra'-য় মূল কাব্যনাট্যের হুবহু অনুসরণ করলেও বেশ কিছু পরিবর্তন আমি লক্ষ করেছি। যেমন, কাহিনি বয়নের ক্ষেত্রে 'Chitra' নাটকের পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মূল কাব্যনাট্যের অনুসরণ করেছেন। মূলের ষষ্ঠ ও অষ্টম দৃশ্যকে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'Chitra'-র ষষ্ঠ দৃশ্য লিখছেন। মূলের সপ্তম দৃশ্যকে বর্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে মুলের নবম, দশম ও একাদশ দৃশ্য যথাক্রমে সপ্তম, অষ্টম এবং নবম দৃশ্যে পরিণত হচ্ছে 'Chitra'-য়। মূল কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' র শেষ দৃশ্যে নিজের স্বরূপে ফিরে আসার মুহূর্তেই চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে 'আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।' আর সেই মুহূর্তেই হয়েছে সূর্যোদয়। 'Chitra'- য় অবগুণ্ঠন মোচন হয়েছে বেশ কিছুটা আগেই। "[Unveiling in her original male attire]. Now, look at your worshiper with gracious eyes."[১৩] এছাড়াও মুলের অনেক কিছুকেই বর্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন –

"ধন্য সেই মুগ্ধ মুর্খ ক্ষীণ-তনুলতা
পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ।"[১৪]

মদন ও বসন্তের কাছে চিত্রাঙ্গদার এই কথন 'Chitra' য় নেই। এছাড়া, অনেক সংলাপ ইংরেজি অনুবাদে সংক্ষিপ্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন, 'চিত্রাঙ্গদা' য় দেখি, মদনের কাছে অর্জুনকে প্রথমবার দেখার অনুভূতি যখন চিত্রাঙ্গদা প্রকাশ করছে –

" সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সন্মুখে আমার, - ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে উর্দ্ধে
চক্ষের নিমেষে।"[১৫]

তা 'Chitra' য় অনুবাদ করেছেন –

> "Instantly he leapt up with straight, tall limbs, like a sudden tongue of fire from a heap of ashes."[১৬]

এর প্রধান কারণ হল ভাষাগত রূপান্তর। সাধারণ অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের প্রধান লক্ষ্যই হল যে ভাষায় লেখাটি অনূদিত হচ্ছে তাতে মূল ভাব যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা। কিন্তু প্রতিটি শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ সেই শব্দভান্ডারে থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু

পাশ্চাত্য পাঠকদের জন্য অনুবাদ করছেন তারা ভারতীয় ঐতিহ্য, পুরাণ সম্পর্কে কতটা তথ্য সমৃদ্ধ সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মূলের বেশ কিছু পরিবর্তন আনছেন। যেমন পঞ্চশরকে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে বলছেন 'The Lord of Love'। এছাড়া অনেক একোক্তি ও আবেগাকুল সংলাপকে বর্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্জুন যখন সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে আবেগাপ্লুত সংলাপ রাখছেন তার অনেক অংশই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে বর্জন করেছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য পাঠকের ভাবনাচিন্তার পরিসরের মধ্যেই তাঁর রচনাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। আর সেক্ষেত্রে তাদের ভাষার যথার্থ প্রকৃতিকে বজায় রাখতেও সচেষ্ট ছিলেন। তাই ফলত এটি কাব্যনাট্য হয়ে উঠতে পারেনি নাট্য হিসেবেই সফল সৃষ্টিকর্মের আসন লাভ করেছে। আসলে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, সেটি কিন্তু তখন আর কাব্যনাট্য থাকছে না। সেটি হয়ে উঠছে কেবলমাত্র নাটক।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন তাঁর সৃষ্টিকর্মকে নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। কখনো তিনি গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন, কখনো পূর্বে রচিত নাট্যকর্মকে সংশোধন, পরিমার্জন করেছেন। এই সব মিলিয়ে কাব্য, নাটক, সঙ্গীত আঙ্গিকের সকল ক্ষেত্রে নিত্য নতুন পরীক্ষায় রত থেকেছেন তিনি। গীতিনাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য গানের মধ্যে দিয়ে নাট্যবস্তুকে রূপ দেওয়া। গীতিনাট্যে সংলাপের ভূমিকা নেয় সংগীত। অভিনয়ের সকল রীতি বজায় থাকে। কেবল নাট্যবস্তু গানের সুরে অভিব্যক্ত হয়। কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে কাব্য গানের স্থান অধিকার করে। সেইসঙ্গে নাট্যধর্ম প্রকাশ পাওয়ায় তাকে কাব্যনাট্য আখ্যা দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৮ ভাদ্র ১২৯৯, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৬১, পৃ. ৬
২। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রথম খন্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ – অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পরিবর্ধিত সংস্করণ – বৈশাখ, ১৩৫৩, পুনর্মুদ্রণ – অগ্রহায়ণ ১৩৯২, পৃ. ৩৪০
৩। বেদব্যাস, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন। মহাভারতম্ (আদিপর্ব্ব)। শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ – ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ – চৈত্র, ১৩৮৩, পৃ. ২০০৪
৪। তদেব। পৃ. ২০০৫
৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ (প্রথম খন্ড)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা -১৭, প্রথম প্রকাশ – মাঘ, ১৪০৬, পৃ. ৩২৭
৬। তদেব। পৃ. ৩২৯
৭। তদেব। পৃ. ৩৩০ – ৩৩১
৮। তদেব। পৃ. ৩৩২
৯। তদেব। পৃ. ৩৩২ - ৩৩৩
৯। তদেব। পৃ. ৩৩৫ – ৩৩৬
১০। তদেব। পৃ. ৩৩৮
১১। তদেব। পৃ. ৩৫৭

১২। Tagore, Rabindranath. 'CHITRA', A PLAY IN ONE ACT (THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE, EX LIBRIS C.K. OGDEN), PUBLISHED BY THE INDIA SOCIETY LONDON 1913, PAGE 33

১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খন্ড। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১, পৃ. ১৬৬

১৪। তদেব। পৃ. ১৬৩

১৫। Tagore, Rabindranath. 'CHITRA', A PLAY IN ONE ACT (THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE, EX LIBRIS C.K. OGDEN), PUBLISHED BY THE INDIA SOCIETY LONDON 1913, PAGE 3

সহায়ক গ্রন্থ:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৬/২ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা – ৭০০০০৭, গ্রন্থ-প্রকাশ – ১৩১৯, সুলভ সংস্করণ – জৈষ্ঠ, ১৩৬০ (বিশেষ সংস্করণ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬)

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৮ ভাদ্র ১২৯৯, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৬১

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-নাট্য-সংগ্রহ (প্রথম খন্ড)। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা -১৭, প্রথম প্রকাশ – মাঘ, ১৪০৬

৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খন্ড। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

৫। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, প্রথম খন্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৭, প্রথম প্রকাশ – অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পরিবর্ধিত সংস্করণ – বৈশাখ, ১৩৫৩, পুনর্মুদ্রণ – অগ্রহায়ণ ১৩৯২,

৬। বেদব্যাস, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন। মহাভারতম্ (আদিপর্ব্ব)। শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ – ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ – চৈত্র, ১৩৮৩

৭। বসু, সৌমিত্র। রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণশৈলী উনিশ শতক', সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২৯ শে অগ্রহায়ণ, ১৪০০

৮। পাল, হরনাথ। নাট্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ। ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা – ৭০০০১২, প্রথম সংস্করণ মহালয়া, ১৩৬৭

৯। Tagore, Rabindranath. 'CHITRA', A PLAY IN ONE ACT (THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE, EX LIBRIS C.K. OGDEN), PUBLISHED BY THE INDIA SOCIETY LONDON 1913